International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-V, Issue-IV, July 2019, Page No. 07-15
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v5.i4.2019. 7-15

অষ্টাদশ শতকের বাংলা ও রামপ্রসাদ সেনের শাক্তপদ

সহেলী ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং
আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, সিটি কলেজ, কলকাতা

Abstract

Shakta Sadhak Ramprasad Sen appeared in the troubled socio-economic environment of the eighteenth century Bengal. Indeed, the first true beginning of Shakta Song is through him. The eighteenth century socio-economic turmoil, the change in political potholes, attacks of bargi and the aggression of English merchants were all stored in the experience of Ramprasad. And in the troubled times, the worship of the mother to seek shelter from the feeling of insecurity of the ordinary people was expressed in the Shakti verses of ramprasad. Marks of time are found effortlessly in his writing.

Keywords: Eighteenth century Bengal, Ramprasad sen, Shakta Song, Worship of Mother, Marks of time.

বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী বাংলায় এক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলকাব্য তথা মঙ্গল দেব-দেবীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। আর এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয় জাতির আগমন, আক্রমণ ও প্রতিষ্ঠার সন্ধিকালে অষ্টাদশ শতকে দেখা দিল এক নতুন দেবতা, শ্মশানচারিণী কালী। এই নতুন দেবতার আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় বাংলার রাষ্ট্রিক ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক এক বিপর্যস্ত কাল। অষ্টাদশ শতকের প্রায় শুরু থেকেই বিদেশী বণিক সভ্যতার সংস্পর্শে এবং যন্ত্র সভ্যতার বীজ বপনে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন পরিবর্তিত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী শতকগুলিতে মুসলমান শাসনের অনিশ্চয়তা থাকলেও গ্রামজীবন মোটের উপর সুরক্ষিত ও স্বয়ং নির্ভর ছিল।

সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে বাংলার শাসন-তান্ত্রিক স্থিরতা বারবার বিঘ্নিত হয়েছিল। মোঘল সুবাদারদের রাজস্ব আদায়ের নতুন পদ্ধতি নবাবি আমলে আরও কঠোর হয়েছে। অপরদিকে বিদেশি বণিকদের আগ্রাসনে দেশের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে বিদেশি পণ্যের প্রসার বাংলার নিজস্ব বাণিজ্যকে শ্রীহীন করে তুলেছিল। বোধহয় সেইজন্যই সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের মঙ্গলকাব্যগুলিতে কোথাও বণিক উপাখ্যানের অবতারণা ঘটতে দেখা গেল না। বস্তুত, মোঘল শাসন কালের অন্তিম সময় থেকে স্বাধীন নবাবি আমলের রাজত্বকাল পর্যন্ত বাংলার শাসন-তান্ত্রিক বিশৃঙ্খলতা ক্রমশ বৃদ্ধিমান। সপ্তদশ শতকের শেষ থেকেই কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে মুর্শিদকুলি খাঁ ও আলিবর্দি খাঁ রাজস্ব আদায়ের জন্য উৎপীড়নমূলক নীতি অবলম্বন করলেন, রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারি ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে তোলা হতে লাগল। দেশের অস্থিতিশীল শাসন, মগ ও পর্তুগিজ দস্যুদের হানা, বর্গীর আক্রমণ, সিংহাসনের ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র এবং সেই কারণে শাসন শৈথিল্য, ভূমি

থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ, সম্পন্ন পরিবারের আকস্মিক ভাগ্য-বিপর্যয় – এই সব কিছুই তখন দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠতে লাগল।

মুর্শিদকুলি খাঁ যে শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থার প্রচলন করলেন তার কঠোরতায় ভূস্বামী ও সাধারণ প্রজাদের অনেক বেশী দুর্গতির কারণ হয়ে উঠছিল। আবার বর্গীর আক্রমণ বাংলার বুকে এক তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল যা শুধুমাত্র বৈষয়িক জীবনের বিপর্যস্ততার কারণে নয়, মানসিক নিরাপত্তা-হীনতার কারণেও। গঙ্গারামের ‘মহারাষ্ট্র পুরাণ’ ও ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’-এও সেই সময়কার বর্গী আক্রমণের ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। অপরদিকে পর্তুগিজ, ফরাসি ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে বাংলায় তথা ভারতে তাদের রাজদণ্ড স্থায়ী করতে তৎপর হয়েছে।

মুর্শিদকুলি খাঁর পরবর্তী সময়ে সুজাউদ্দিনের শাসনকালে দ্রব্যমূল্যের পরিমাণ অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী শাসক আলিবর্দির শাসনকালেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বর্গী আক্রমণ, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ ছিল।

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতন ঘটলে বাংলায় পরাধীনতার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। সেই সময় থেকে বাংলায় যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল তার সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাবটি ছিল আর্থিক ক্ষেত্রে। কোম্পানি নবাবের কাছ থেকে শাসনকার্য পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিলেও নিজেরা কিছু করত না। তৎকালীন শাসনব্যবস্থা দূর্নীতি ও সীমাহীন নৈরাজ্যের স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। তার সাথে যুক্ত হল দস্তকের অপব্যবহার।এরই মধ্যে দূর্নীতিগ্রস্থ লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বার বাংলায় আসেন দূর্নীতি দমন করতে। কোম্পানির সকল কর্মচারীরাই নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করতেই ব্যস্ত। সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল প্রাণান্তকর। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে আরও বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা। প্রথম অবস্থায় কোম্পানি বাংলায় ব্যবসা করার জন্য দেশ থেকে অর্থ আনলেও পলাশীর যুদ্ধের পর তা বন্ধ হয়ে যায়। পরিবর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বাণিজ্যের পুঁজি বাংলা থেকেই সংগ্রহ করা হবে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে কোম্পানির অংশীদাররাও তাদের লগ্নী-কৃত মূলধনের উপর ১২.৫% হারে লভ্যাংশ আদায় করতে থাকে। ব্রিটিশ সরকারও এই সময় বার্ষিক ৪০হাজার পাউন্ড আদায় করার ব্যবস্থা করে। কোম্পানির কর্মচারীরাও অবৈধভাবে বিপুল অর্থ উপার্জন করতে থেকে। সেই সময় ইংল্যান্ডে ক্লাইভ অভিহিত হতেন ‘ভারতীয় নবাব’ বলে।

হেস্টিংসের সময়কালে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটে। ইজারাদারি ব্যবস্থার পরিবর্তে ‘পাঁচশালা বন্দোবস্ত’ (১৭৭২-১৭৭৭) প্রবর্তিত হয়।কিন্তু ইজারাদাররা কোম্পানিকে সময়মত অর্থ না দেওয়ায় কোম্পানির আয় অনিশ্চিত হয়ে পড়লে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত হয় ‘একসালা বন্দোবস্ত’। এই বন্দোবস্ত ছিল ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর চরম আঘাত। প্রাচীন জমিদারেরা অনেকেই বিলুপ্ত হয়ে যান। বাৎসরিক বন্দোবস্ত ও তা আদায়ে কঠোরতার কারণে বাংলার প্রায় সব প্রাচীন ও বৃহৎ জমিদারীগুলি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারিগুলি নিলামে উঠতে থেকে। পরবর্তীকালে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’-এ পরিণত হয়। এই ব্যবস্থায় সরকারের আয় নির্দিষ্ট হলেও আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কোম্পানির আগ্রাসী শোষণ নীতির ফলে সম্পন্ন ভূস্বামীরা দেউলিয়া হয়ে পড়তে থাকে। সূর্যাস্ত আইন দ্বারা বহু জমিদার জমিদারি হারিয়ে ফেললে ভুঁইফোড় জমিদারের সৃষ্টি হয়। প্রজাকল্যানের পরিবর্তে প্রজা শোষণই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই অনুপস্থিত জমিদারেরা শহরে বিলাস-ব্যসনে ব্যস্ত থাকত আর গ্রামগুলি শ্রীহীন অবস্থায় পড়ে থাকত। এই সময় কৃষির বাণিজ্য-করণ ঘটে। কৃষকদের ধান-গমের পরিবর্তে নীল-আখ-পাট-তুলা চাষে বাধ্য করে ইজারাদারেরা। ফলে কৃষকের অন্ন-সংকট আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই মধ্যে মধ্যসত্ত্বভোগী পত্তনিদারের সৃষ্টি হলে প্রজা ও কৃষকদের আরও মর্মান্তিক অবস্থা হয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে জমিদারেরা সরকারকে ৩৫ লক্ষ পাউন্ড রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হলেও রায়তদের থেকে

তাদের আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ছিল **১**কোটি ৩৫লক্ষ পাউন্ড। এই বাড়তি আয়ের কোন অংশ তারা কোম্পানিকে দেয়নি।

এই রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থার যুগে প্রত্যেকটি মানুষ এমন এক আশ্রয় খুঁজছিল যেখানে তারা সর্ব দুঃখ, সর্ব সঙ্কট থেকে রক্ষা পেতে পারে। বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে তারা সেই আশ্রয় পাচ্ছিল না। অষ্টাদশ শতকের সময়কালে বৈষ্ণব ধর্মের বলিষ্ঠ প্রেম-ধর্মের প্রাণপ্রাচুর্য ক্ষয়ে আসছিল, তা দুর্বল-ভাবালুতা পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম গুরুবাদ সর্বস্ব হয়ে পড়ায় গুরুপ্রসাদীর ব্যভিচার জনসমাজকে বিমুখ করে তুলেছিল, তারা আর আশ্বস্ত হতে পারছিল না। সাধারণ মানুষ তখন উন্মুখ হয়ে উঠেছিল এমন এক আশ্রয়ের জন্য যেখানে দুর্বলতা নেই,ব্যভিচার নেই, যেখানে পরম নির্ভরতায় আত্মসমর্পণ করা যায়, অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। এই আশ্রয় তারা পেলেন 'কালভয়হারিণী' জগজ্জননীর চরণে। শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতায় যেখানে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে' সেখানে মায়ের চরণই একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র ভরসাস্থল যেখানে অভিযোগ-অনুযোগ-অভিমান জানানো যায়।

এই সময় আখ্যান-কাব্যের দীর্ঘ বিলম্বিত ছন্দে দৈবী মহিমা উচ্চারণের নয়। দুর্যোগের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে মাতৃ মহিমাকে জাগ্রত করার উৎকণ্ঠিত প্রয়াসই এই সময়কালে মানুষকে তাড়িত করেছে। অষ্টাদশ শতকের দুর্ভাগ্যের প্লাবনে মাতৃনামের নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে চেয়েছে মানুষের মন। বস্তুত শক্তি উপাসনা ,অষ্টাদশ শতকের পূর্বেও বহমান ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে শক্তি উপাসনা আনুষ্ঠানিক কদর্যতা, পঞ্চ ম-কার সাধনা ইত্যাদিকে গৌণ করে মানবিক চিত্তবৃত্তির প্রকাশক হয়ে উঠল। কবিরা শ্মশানের বীভৎসতার মধ্যে মায়ের স্নেহছায়া খুঁজে নিতে চাইলেন।

জীবনের দৈনন্দিন প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করার মানসিক তাড়নাই কি এই মাতৃ-সাধনার কারণ? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকেই বাংলায় কালীপূজোর সমারোহ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়কালে বাংলার অনেক জমিদার-ভূস্বামীরা ডাকাতি করে ধনসম্পদ বৃদ্ধি করেন। তারা এই গোপন ডাকাতি পেশার প্রেরণা স্বরূপ কালীপূজা করতেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের কালীমূর্তি 'ডাকাতে কালী' নামে পরিচিত। কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রজাদের এই পূজা পালনের যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন তেমনি নিজেও মহাসমারোহে কালীপূজা করতেন। তাঁর আজ্ঞায় এক বছরে দশ হাজার কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় পৌত্তলিক উৎসবের অঙ্গ স্বরূপ শাক্ত সঙ্গীত রচনার প্রবণতা কবি সাধকদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

আর এই শাক্তগীতি ধারার সূচনা করেছিলেন রামপ্রসাদ সেন। জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী তাঁর 'ভারতকোষ' গ্রন্থে রামপ্রসাদ সেনকেই শাক্ত সংগীতের পথিকৃৎ সাধক বলেছেন। রামপ্রসাদের পূর্বে এই ধরনের মাতৃ-গীতি বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়নি। মঙ্গলচণ্ডীর গীত, দুর্গামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মধ্যযুগীয় পাঁচালি কাব্যগুলিতে কিছু কিছু দুর্গাস্তব-চণ্ডীস্তব থাকলেও সেগুলি মঙ্গল কাব্যের প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র গানরূপে সর্বসাধারণের স্বীকৃতি পেয়েছে এমন কোন সম্ভাবনার সমর্থন পাওয়া যায় না। যথার্থ শক্তি-গীতি রামপ্রসাদের মাধ্যমেই সূচিত হয়েছিল এই বিষয়ে বিশেষ মতভেদ নেই।

ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে বা তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে রামপ্রসাদ সেন তান্ত্রিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে তিনি বৈদ্য ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসক। অল্প বয়সেই সংস্কৃত ও ফারসিতে বুৎপত্তি অর্জন করেন রামপ্রসাদ। পিতার মৃত্যুতে সংসার প্রতিপালনের তাড়নায় কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী দুর্গাচরণ মিত্রের (মতান্তরে, খিদিরপুরের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের) কাছারিতে মুহুরির (কেরানী) কাজ গ্রহণ করেন। সেক্ষেত্রে তিনি সামান্য ইংরেজিও হয়তো জানতেন। তাঁর বহু পদে ইংরেজি কিছু কিছু শব্দও পাওয়া যায়। যাইহোক, তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় উচ্চবর্গের অধীনতা গ্রহণের মাধ্যমে। রামপ্রসাদের জীবনীকারদের মতে তাঁর পারিবারিক অবস্থা বিপর্যয় এর কারণ। আবার অষ্টাদশ শতকের বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর এই জীবিকা বদলের যোগাযোগ থাকতেই পারে। ভূমি-নির্ভর কৃষিজীবী ও

সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারীদের সচ্ছল জীবনের মাঝে যে শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তারই মধ্যে থেকে পরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। আর রামপ্রসাদ সেন ছিলেন তথাকথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অষ্টাদশ শতকীয় প্রতিনিধি স্বরূপ। যাইহোক, মুহুরির কাজ করার সময়ে হিসাবের খাতায় শ্যামাসংগীত রচনা করায় তাঁর নামে তহবিলদার দুর্গাচরণ মিত্রের কাছে নালিশ জানায়। কিন্তু রামপ্রসাদের কবিত্বে মুগ্ধ মনিব কবিকে কর্মবৃত্তি থেকে মুক্তি দিয়ে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি দিয়ে গ্রামে ফিরে শক্তি সাধনার সুযোগ করে দেন। এরপর তিনি কালীকীর্তণ ও কালী-সাধনায় মগ্ন থাকলেও বাঁকুড়া রায়ের অনুরোধে 'বিদ্যাসুন্দর' পালা লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি 'কবিরঞ্জন' উপাধি পান।

সাধারণত সাধক কবিরা দেশকালকে গুরুত্ব না দিয়ে সাধনায় মগ্ন থাকেন। রামপ্রসাদও সাধক কবি। কিন্তু তিনি দেশকালকে উপেক্ষা করেননি। বরং দেশকালকে জারিত করে নিয়েছেন নিজ কাব্য সাধনায়। সংসার বিচ্যুত হয়ে নয়, জীবনধর্মে থেকেই তাঁর সাধনার মার্গে মগ্ন থেকেছেন। বলা ভালো, কবি নিজে সংসারের খুঁটি থেকে দূরে থাকতে চাইলেও দেবীই তাঁকে সংসার খুঁটিতে বেঁধেছেন। তাঁর কাব্যে ব্রহ্মময়ী ঘরোয়া জননী হয়ে উঠেছেন।

রামপ্রসাদের গান সাধনা, আত্মসমর্পণ ও তেজে পরিপূর্ণ। সেখানে আগম-তন্ত্রের তত্ত্ব থাকলেও তা দুর্বোধ্য বা নীরস নয়। দেশকালের তাড়নায় যেখানে অন্যান্য কবিরা দেবতাদের মর্ত্যলোকে নামিয়ে দৈবে অনাস্থা প্রকাশ করছেন, সংশয় প্রকট করছেন—সেখানে রামপ্রসাদ দেবীকে আত্মচৈতণ্যের মধ্যে উপলব্ধি করে দেবীর কাছেই নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছেন। সেই দেবী কখনো কন্যা, কখনো বা জননী। বস্তুত, অষ্টাদশ শতকের নৈরাজক পরিস্থিতিতে পরিবারের সর্বংসহা জননীর মধ্যে দেবীকে অনুভব করা যুক্তিযুক্তও বটে।

রামপ্রসাদের অনেক পদে অষ্টাদশ শতকীয় সমাজজীবনের পাণ্ডুর ছবি ফুটে ওঠে যেখানে একদিকে কেন্দ্রীয় শাসকদের থেকে কেউ কৌশলে বিরাট ভূসম্পত্তির মালিকানা করায়ত্ত করেছে, অন্যদিকে কৃষিজীবী মানুষদের সামান্য কৃষিজমিও হারাতে হচ্ছে; অন্য বৃত্তির খোঁজ করতে হচ্ছে। আবার কোথাও একদিকে বিত্তবানদের কালীপূজা-দুর্গাপূজার অপরিমিত ব্যয়-বিলাস, অন্যদিকে নিরন্ন মানুষের হাহাকার। একদিকে নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ রায় কোম্পানিকে বার্ষিক রাজস্ব দিচ্ছেন বাহান্ন লক্ষ টাকা, আর অপরদিকে রামপ্রসাদের পদে,- 'নুন মেলে না আমার শাকে' [১] -এতো তৎকালীন অর্থনৈতিক বৈষম্যেরই প্রতীক।

জায়গীরের রাজস্ব ও মাসিক বৃত্তিতে রামপ্রসাদ হয়তো ব্যক্তিগতভাবে মোটামুটি সচ্ছল ছিলেন, কিন্তু সমকালীন জীবন তাঁকে সাধারণের অবস্থার সঙ্গে মানসিকভাবে একীভূত করে দিয়েছিল। তাঁর শাক্তপদে তাই উপবাস জর্জর দারিদ্রের ক্ষুধাকে সংযুক্ত করে দিতে পেরেছিলেন।

রামপ্রসাদের পদে সমকালীন জীবনের যে হতাশা-নৈরাশ্য, ছিন্নমূল জীবনের ভয়ার্ত রূপ ও আশ্রয় প্রার্থনার আকুতি প্রকাশ পেয়েছে তার পশ্চাৎপট অবশ্যই বাংলায় মারাঠা বর্গী আক্রমণ ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ১৭৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দে মারাঠারা 'চৌথ' অর্থাৎ রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ আদায়ের জন্য বাংলায় যে আক্রমণ চালায় ইতিহাসে তা বর্গী আক্রমণ নামে পরিচিত। এই সময়কালে রামপ্রসাদের বয়স আনুমানিক ২২-২৫ বছর। এই বর্গী আক্রমণের হাত থেকে নবাব, রাজা-মহারাজা, জমিদার থেকে বেনে, মুদী, কৃষক- নিস্তার পায়নি কেউ। বর্গী আক্রমণের প্রথম অবস্থায় বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ পরাজয় স্বীকার করে কাটোয়া থেকে পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে পাটনা ও পূর্ণিয়া থেকে ফৌজ এসে নবাবের শক্তিবৃদ্ধি ঘটায় এবং নবাব কৌশলে মারাঠা সেনাদের প্রধান ভাস্কর পণ্ডিতকে ডেকে পাঠান ও হত্যা করেন।

বর্গী আক্রমণ পরবর্তী দারিদ্রের হাহাকারই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমি নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পূর্বেও সাধারণ প্রজাদের প্রতি নবাবদের উদাসীনতা ছিল যা পলাশীর যুদ্ধের পর আরও বৃদ্ধি পেল। তখন নবাব কোম্পানির সাজানো পুতুল মাত্র। সিরাজদৌল্লার পরবর্তী নবাবদের কোম্পানি শুধুমাত্র মসনদে আসীন করতো প্রজাদের থেকে যে কোনও প্রকারে রাজস্ব আদায়ের জন্য। আর যখনই কোন নবাব কোম্পানির আদেশ মান্য করতে

চায়নি তখনই বেধেছে সংঘাত। সিংহাসন লোভী সুবেদার-সেনাপতিদের ষড়যন্ত্রের কথাও এখানে উল্লেখ্য। ইংরেজ-শক্তির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা আর বাংলার মসনদে আসীন হওয়ার ষড়যন্ত্রের আবহে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় চরমে ওঠে। এই সময় ধর্মীয় সংকীর্ণতা, ধর্মের নামে ভণ্ডামি যুগধর্মে পরিণত হয়। মহাপ্রভুর নিষ্কাম প্রেমসাধনা নিমজ্জিত হতে থাকে সকাম দেহ-সাধনায়। কালী তখন কোথাও তন্ত্রসাধনার দেহ-লীলার অঙ্গ, কোথাও ডাকাতদের উপাস্যা, কোথাও বা বিদ্যা ও সুন্দরের কাম লীলার দেবী। নৈরাজক পরিস্থিতিতে কেউ কেউ আবার প্রভূত সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে মহাসমারোহে লীলা প্রচার করে ভণ্ড সাধকও হয়ে উঠেছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করলেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। ইংরেজ শাসনের পাঁচ বছর অতিক্রম হতে না হতেই দুর্ভক্ষ দেখা দিল।

রামপ্রসাদ সেনকে তথা তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে আলোচনা করলে এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে অস্বীকার করা যায় না।তিনি বর্গীর অত্যাচার দেখেছেন, দেখেছেন মারাঠাদের আক্রমণে বাংলার গ্রামগুলির শ্মশাণে পরিণত হওয়া, দেখেছেন মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ও সিরাজের পতন, দেখেছেন কোম্পানির বঙ্গ বিজয়। হেস্টিংসের শাসন পর্যন্ত সম্ভবত তিনি জীবিত ছিলেন। ফলত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, দ্বৈতশাসন- এবং এর প্রতিক্রিয়ায় বাংলার অরাজক অবস্থা –সবই তাঁর অভিজ্ঞতার সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থান, এই হতাশা, এই হাহাকারের মধ্যে রামপ্রসাদ মাতৃচরণে একনিষ্ঠ ভক্তি-স্থাপনা করেছেন – আর সেই ভক্তিতে ভাগ্য-বিড়ম্বিত মানুষগুলোর ক্ষুধার হাহাকার অনুক্ত থাকেনি—

"অন্ন দে গো, অন্ন দে গো, অন্ন দে,
জানি মায়ে দেয় ক্ষুধার অন্ন অপরাধ করিলে পদে পদে।
মোক্ষপ্রসাদ দেও অম্বে, এ সুখে অবিলম্বে
জঠরের জ্বালা আর সহে না তারা
কাতরা হইও না প্রসাদে।"[২]

তাঁর 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ের পদগুলিতেও বিত্তবান ও বিত্তহীনদের অবস্থানগত বৈষম্যই প্রাধান্য পেয়েছে। কারোর অনুচিত সৌভাগ্য বৃদ্ধি কারো বা অন্তহীন দুর্ভাগ্য- এই বৈষম্য এই বৈপরীত্যে বিপন্ন কবি মায়ের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন—

"মরি গো এই মনের দুঃখে।
(ওমা বিনে দুঃখ বলব কাকে)।।
এ কী অসম্ভব কথা, শুনে বা কি বলবে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটের ভুকে।।
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা, রাখলে যারে পরম সুখে।
ও মা আমি কত অপরাধী, নুন মেলে না আমার শাকে।।
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে, পাছার মারিলে আমার বুকে।
ও মা, মায়ের মতো কাজ করেছ, ঘোষিবে জগতের লোকে।"[৩]

-আক্ষেপের কথা পদটিতে থাকলেও এই সামাজিক বৈষম্যকে দেবীর কল্যানপ্রসূ ইচ্ছা বলে মানতে পারেননি রামপ্রসাদ। তাই এই 'অসম্ভব কথা', এই বৈষম্যের আসল কারণ শক্তিমান হঠকারী শাসকের অরাজক শাসন ও শাসনকর্তার প্রতি পরোক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশ নয় কী?

অষ্টাদশ শতকের গ্রামকেন্দ্রিক বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর জীবনধারা তথা কৃষিজীবী মানুষগুলি আকস্মিক আশঙ্কার বূহ্যে চলে গেল। হঠকারী শাসনকর্তাদের ঘৃণ্য অত্যাচার ক্রমশ বাড়তে লাগল। এই কারণগুলি ধীরে ধীরে মানুষকে

নগরাভিমুখী করে তুলেছিল। অথচ তখনো তারা নাগরিক জীবন যাপনের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তাদের মনের মধ্যে রয়ে গেছে গ্রামজীবনের স্মৃতি অথচ পরিস্থিতি তাদের জীবিকা বদল করতে বাধ্য করেছে। এহেন মানুষদের কৃষিকাজের বদলে মুহুরিগিরির বৈষয়িক জটিলতার পরাধীনতা স্বীকার করত হলে যা মনে অবস্থা হয় তা রামপ্রসাদের পদে ফুটে ওঠে,-

"মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমি রৈলো পড়ে, আবাদ করলে ফলত সোণা।।
কালীর নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।
(মনরে আমার)
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসেনা।"[৪]

পলাশীর যুদ্ধে ভারতে ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদের পতাকা উড়েছে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করেছে। রামপ্রসাদ তখনও জীবিত। প্রচলিত তথ্যানুযায়ী রামপ্রসাদ সেন চাকরি-সূত্রে কলকাতায় এসেছিলেন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস ফৌজদারি ও নগর দেওয়ানি আদালত কলকাতায় স্থাপন করেন। এই ইংরেজ প্রবর্তিত আদালতের কার্যপ্রণালীর সঙ্গে সাধারণ জনজীবনও সম্পৃক্ত হয়ে উঠছিল তার আভাস রামপ্রসাদের পদে পাই যখন দেখি 'ডিক্রি', 'ডিসমিস'-ইংরেজ-শাসন পরবর্তী এই শব্দগুলিও সময়োপযোগী রূপে ব্যবহৃত বা প্রযুক্ত হয়েছে।

একটি পদে দেখি তিনি বলছেন,-

"মর্‌লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইক গেঁটে।।
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিনমজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তারা কার কথা কেউ শুনে না, দিন আমার গেল কেটে।।"[৫]

-অষ্টাদশ শতকের সাধারণ মানুষের বাস্তবিক অবস্থা পদটিতে বর্ণিত। এই পীড়ন তো অত্যাচারী শাসকের শোষিতের উপর পীড়ন। সরকারী কর্মচারী হলেও উচ্চপদস্থ কর্মী বা নবাব-জমিদার-বিদেশী বণিকদের ঠেলায় তার সকল কর্মফলই বৃথা যেত। প্রতিদিনের দীনমজুরী করেও তার অভাব দুর করতে পারত না। পদটির রূপকার্থে সাধনের কথা থাকলেও বাচ্যার্থটি সম-সময়ের জীবন বাস্তবতার জীবন্ত দলিল।

রামপ্রসাদ তাঁর সময়কে দেখেছেন, দেখেছেন মানুষের মর্মবেদনা-হাহাকার- সবকিছুই তাঁর মধ্যে আক্ষেপের সৃষ্টি করেছে। একসময় সেই আক্ষেপের প্রকাশ তাঁর 'মা'কে তিনি জানিয়ে যখন কোন আশানুরূপ ফল পেলেন না তখন তা অভিমানে পরিণত হয়েছে। বস্তুত, মায়ের কাছে সন্তানের আক্ষেপ-অনুযোগ-অভিমান সবই তো যেন চিরন্তন অধিকার। সেই অধিকার থেকেই অভিমানী রামপ্রসাদ 'মা'কে বলতে পারেন,-

"আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী।।
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি।
ও মা তুমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিখারি।।
জ্ঞান-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান-ধর্ম্ম তদুপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরাপারে, যাননি সেই ব্রজেশ্বরী।"[৬]

-পদটির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ-"অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।"
-অষ্টাদশ শতকের সময়ের ধর্মকে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছে এই উদ্ধৃতি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আবার কখনও তিনি বলছেন,-

"আমি কি আটাসে ছেলে।
ভয়ে ভুলব নাকো চোখ রাঙ্গালে।।
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদকমলে।
ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে।।
শিবের দলিল সই মোহর, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রি লব এক সওয়ালে।।
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরু-দত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিল কালে।।
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়, শান্ত করে লবে কোলে।"[৭]

-কবি সাধক হলেও সম-সময়ের জীবন্ত সত্যকে আগ্রাহ্য করতে পারেননি। তাই তাঁর পদে মামলা-মোকদ্দমার কথাও উঠে এসেছে। অষ্টাদশ শতকের নবাব কর্তৃক জমিদার, জমিদার কর্তৃক ছোট জমিদার, ছোট জমিদার বা জায়গিরদার কর্তৃক সাধারণ মানুষদের জোরপূর্বক সম্পত্তির মালিকানা হস্তগত করার ঘটনা প্রায়ই ঘটত। পদটিতে রামপ্রসাদ যেন সাধারণ প্রজাদের অভয় দিয়ে বলতে চান অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করলে চলবে না। "আটাশে ছেলে" (আট মাসে ভূমিষ্ঠ বা ভীরু) হলে চলবে না। প্রতিরোধ করার প্রয়োজন আছে। সিলমোহর দেওয়া দলিল নিয়ে আদালতে মোকদ্দমা করার এবং 'ডিক্রি' আদায় করে নিজ পক্ষে মামলার নিষ্পত্তি করে তবে ক্ষান্ত হওয়ার পরামর্শ দেন রামপ্রসাদ। পদটির সাধন অর্থ যাই হোক না কেন সময়ের সত্যকে ধারণ করেই পদটি গড়ে উঠেছে তা স্পষ্ট।

সাধারণত, সাধনগীতির ক্ষেত্রে বাচ্যার্থের পরিবর্তে রূপকার্থই মুখ্য হয়, কিন্তু রামপ্রসাদের পদে সময়ের দাবীর প্রকটতায় বাচ্যার্থ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।রামপ্রসাদের একটি পদে দেখি,-

"মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে আমার উপর, কল্লে দুঃখের ডিক্রীজারি।।
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছটারে, গরল খাইয়ে প্রাণে মারি।।
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐ পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি, তারে দিলি জমিদারী।।
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকাকড়ি।
আমায় ফিকিরে ফিকির বানায়ে, বসে আছে রাজকুমারী।।
হুজুরে উকিল যে জন, ডিস্‌মিস্ তাঁর আশায় ভারি।
করে আসল সন্ধি সওয়াল বন্দি, যেরূপেতে আমি হারি।।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ, তাও নিয়াছে ত্রিপুরারি।।"[৮]

-পদটিতে পঞ্চেন্দ্রিয় ও ষড়রিপুর তাড়নায় সাধন-মার্গে বিঘ্নের প্রসঙ্গ গৌণ হয়ে গিয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে সমসময়ের ইতিহাস। ব্রহ্মময়ী তাঁর ভক্ত সন্তানের উপর ডিক্রী (হুকুমনামা) জারি করেছেন এবং তাঁর নির্দেশেই ছটি হুকুমনামা নিয়ে পেয়াদা ভক্তকে পীড়ন করে। সাধকের পদে ব্রহ্মময়ী মাতার কাছে এরূপ অভিযোগ বা ষড়রিপুকে

জয় করার রূপক সাধকের পদে পাওয়ারই কথা। কিন্তু রামপ্রসাদের এই পদে রূপকার্থের বদলে বাচ্যার্থই প্রধান হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পদটিতে তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে 'প্যাদার রাজা' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সেই সময়ে বড় জমিদারেরা ছোট জমিদারদের মাধ্যমে নবাবের হুকুমনামা অনুযায়ী প্রজাদের থেকে রাজস্ব আদায় করত। দিল্লীর সুবেদার থেকে বাংলার স্বাধীন নবাব—প্রত্যেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য নিত্য নতুন হুকুমনামা পাঠাতেন। এদের হুকুমনামার ঠেলায় অস্থির থাকতেন স্বয়ং জমিদাররাই, সেক্ষেত্রে জমিদারদের প্রেরিত 'প্যাদা'(পেয়াদা)-এর পীড়নে প্রজা সাধারণের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সাধক যেমন ষড়রিপুকে জয় করতে সচেষ্ট থাকে, ষড়রিপুকে সংহার করতে চায় প্রজাসাধারণও তেমনি ঐ পেয়াদাদের প্রতিরোধ করতে চায়—যদিও তাদের শক্তির কাছে সাধারণের প্রতিরোধ আর কতটুকু? আবার যখন রামপ্রসাদ বলেন,-

"ঐ পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি, তারে দিলি জমিদারী"[৯]

-তখন সামান্য ব্যবসায়ীর হটাৎ ধনী হয়ে নিলামে জমিদারী কেনার ঐতিহাসিক সত্যটি সাধক উল্লেখ করে যেন সমসময়ের অরাজকতার বাস্তব রূপটিকে উজ্জ্বল করে তোলেন। আবার বিচার ব্যবস্থার বিশৃঙ্খল অবস্থাও সাধকের অগোচর নয়। সাধক রামপ্রসাদ সাধনার রূপকে বলেছেন মহাদেব কালীনাম প্রচারের অধিকার যে-কাউকে দিয়ে দেন বলে কালীর নামে নিন্দে রটে এবং এই অভিযোগ যে ব্রহ্মময়ী 'মা'কে জানাবেন কিন্তু-

"হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকাকড়ি।"[১০]

-এখানে সাধন অর্থ যাই হোক না কেন বাচ্যার্থটি পরম সত্য যে, সাধারণ দরিদ্র প্রজা বিচারের জন্য অভিযোগ জানাতে চাইলেও পারেনা, কারণ দরখাস্ত তৈরির জন্য উকিলকে যে অর্থ দিতে হবে সে সম্বলটুকুও তাদের থাকে না। কখনও কখনও অভিযোগ জানালে বিশেষ উপায়ে তা বরখাস্ত হয়ে যায়। প্রজারা যে পালিয়ে বাঁচবেন সে পথও বন্ধ—জমিদারদের কর্মচারীদের এড়িয়ে তাদের পালাবার উপায় নেই।

এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, বাচ্যার্থের স্পষ্টতা রামপ্রসাদের পদকে কাব্যগুণের পরিপন্থী করে তোলেনি; তা হয়ে উঠেছে যুগধর্মের কথা, যা কিনা আবার যুগোত্তীর্ণ। তিনি সাধক হলেও আত্মভোলা নন। অষ্টাদশ শতকের বাংলার অস্থিরতা, বিপন্নতা তাঁকে আত্মভোলা হয়ে থাকতে দেয়নি। সাধারণের মনের কথা তাঁর সাধনার বাণীতে সম্পৃক্ত হয়ে সময়ের কথা হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, ভট্টাচার্য্য সনস্ লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৪, পৃ-৩৪৩।
২। তদেব, পৃ-১৬১।
৩। তদেব, পৃ-৩৪৩।
৪। তদেব, পৃ-৩৪০।
৫। তদেব, পৃ- ৩৪২-৩৪৩।
৬। তদেব, পৃ-২৯০।
৭। তদেব, পৃ-২৮৮-২৮৯।
৮। তদেব, পৃ-৩৪৬।
৯। তদেব, পৃ-৩৪৬।
১০। তদেব, পৃ-৩৪৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। সাধক কবি রামপ্রসাদ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৪, ভট্টাচার্য্য সনস্ লিমিটেড, কলকাতা।
২। শক্তিগীতি পদাবলী, অরুণ কুমার বসু, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৯।
৩। শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা, জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, ডি. এম লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১৩।
৪। ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, শশীভূষণ দাসগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।
৫। রামপ্রসাদ বিশেষ সংখ্যা, উবুদশ, বর্ষ ২৪ সংখ্যা ১, জানুয়ারী ২০১৩।
৬। শাক্ত পদাবলী, অমরেন্দ্রনাথ রায়(সম্পা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬০।